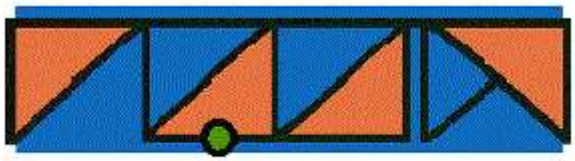

সংখ্যা : ৬৭

বাংলাভাষার ধাতু ও ক্রিয়া, এবং সঞ্জননী ধ্বনিতত্ত্ব

দেবদত্ত জোয়ারদার

(চতুর্থ অংশ)

ক্রিয়ার বানান প্রসঙ্গ (orthography)

রূপধ্বনিগত আলোচনার একটা ব্যবহারিক দিক আছে, সেটা বানান প্রসঙ্গ। বলা বাহুল্য, বাংলা ক্রিয়াপদের বানান বিষয়ে সংস্কৃত ব্যাকরণের কোনো সূত্র সাহায্য করতে পারে না, অতএব নির্ভর করতে হবে রূপ ও ধ্বনি বিবর্তনের নানা খুঁটিনাটির ওপর। সাধুরীতির ক্রিয়াপদগুলির বানান দীর্ঘকাল ধরে সুনির্দিষ্ট, তাদের নিয়ে বিশেষ সংশয় নেই। কেন নেই সেটা একটা প্রশ্ন (পরের অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। অধিকাংশ সংশয় মান্য/লেখ্য চলিত বাংলার বানান নিয়ে। প্রতিটি সংশয় নিয়ে আলোচনা করতে একটি আস্ত প্রবন্ধের প্রয়োজন, কিন্তু আমরা মূল প্রশ্নটা করতে পারি – কী নিয়ে ও কেন এই সংশয়?

অবশ্যই স্বরচিহ্ন নিয়ে এই সংশয়। রূপধ্বনির বিবর্তন থেকে আমরা দেখতে পাই যে মান্য চলিত বাংলার আকৃতিতে পৌঁছোবার পথে স্বরসঙ্গতি ও স্বরলোপের ফলে নানা ধ্বনি পরিবর্তন ঘটে গেছে অথচ লেখ্য রূপের ওপর তার ছাপ স্পষ্টভাবে পড়ে নি। ধাতু অংশের স্বরসঙ্গতিজাত ধ্বনি পরিবর্তনটা ধাতুতে ধাতুতে ভিন্ন - /অ/ → /ও/, /ই/ → /এ/, /উ/ → /ও/, /এ/ → /অ্যা/। যা কিছু প্রশ্ন তা অবশ্য /অ/ → /ও/ এবং /এ/ → /অ্যা/ নিয়েই ওঠে। প্রথম জায়গা /অ/ থেকে /ও/ এই ধ্বনি পরিবর্তনের ক্ষেত্রটা, কারণ এটাই সব থেকে ব্যাপক। কিন্তু করি, হই ইত্যাদি রূপের ক্ষেত্রে এ নিয়ে সমস্যা ততটা নেই কারণ স্বরধ্বনির পরিবর্তনের হেতু /ই/ নিজেই বিদ্যমান। এরা তাই স্বরসঙ্গতির স্বচ্ছ বা transparent দৃষ্টান্ত। পরবর্তী /ই/-এর প্রভাবে /অ/ স্বতই /ও/ হয়ে ওঠে (যেমন, গতি, বই, শরীর), স্বরসঙ্গতিটাই সেখানে বাংলা উচ্চারণের স্বাভাবিক নিয়ম। অসংখ্য তৎসম শব্দের বাংলা উচ্চারণে এই ব্যাপার হচ্ছে, তৎসম শব্দের বানান আদিভাষার অনুরূপ, তাই সদৃশরূপী বাংলা শব্দেও ও-কার দেবার প্রশ্ন কখনও আসে নি। সুতরাং, এই জন্যেই এখানে ও-কার নিষ্প্রয়োজন। সাধুরীতির ক্রিয়া নিয়ে যে সংশয় কম তাও এই কারণেই; বেশির ভাগ রূপেই /ই/ নিজেই উপস্থিত (যেমন, করিয়া)।

আরেকটু জটিল সমস্যা অন্য জায়গায়। আধুনিক ক্রিয়ারূপগুলো অনেক ক্ষেত্রেই স্বরসঙ্গতির অস্বচ্ছ বা opaque দৃষ্টান্ত। যেমন, করছে-র ক-এর উচ্চারণ যে [কো] তার তো কোনো চিহ্ন নেই। অসমাপিকা করে-তে উচ্চারণের ও-কার কোথায়? শব্দমধ্যস্থ /ই/ এখানে লুপ্ত হয়েছে বলেই এই সমস্যা। এখানে কী করণীয়? এখানে চিরাচরিত বানান রীতিকে মর্যাদা

দিতে হবে। এবং মনে রাখতে হবে, বাংলা শিক্ষার্থী (বাঙালি শিশু অথবা ভিন্‌দেশি) ভাষার সঙ্গে যে পরিচিত হচ্ছে তা তার ধ্বনি ও দৃশ্য রূপ দুয়েরই মাধ্যমে। তার দ্বারাই সে এই সমস্যা নিজের অজান্তেই মিটিয়ে নিতে পারে। বানানের ক্ষেত্রে সুমিতি বা economy–র একটা গুরুত্ব আছে। কোনো কল্পিত আতঙ্কে একটা বাড়তি স্বরচিহ্ন (এখানে ও-কার) এনে সেটাকে নষ্ট করার মানে নেই। চলিত বাংলায় সমাপিকা/অসমাপিকার সারূপ্যও একটা সমস্যা। অসমাপিকা হতে/বলে/করে ইত্যাদি রূপগুলিতে ও-ধ্বনি বোঝাতে ঊর্ধ্বকমা আগে চলত (যেমন, ব'লে)। কিন্তু বর্তমানে তা বর্জন করাই বিহিত হয়েছে। চলিত ভাষার সর্বব্যাপী প্রচলনের ফলে কোথায় অসমাপিকা তা প্রসঙ্গ থেকে বুঝতে কোনো অসুবিধে নেই। কেবল অর্থের প্রভেদ স্পষ্ট করার জন্য সামান্য কয়েকটি জায়গায় ও-কার দেওয়া চলে, যেমন, হন (বর্তমান) : হোন / হোক (অনুজ্ঞা)।

সমস্যাটা আরও একটু গুরুতর হয়ে ওঠে যেখানে /এ/ ধ্বনি স্বরসঙ্গতিতে /অ্যা/ হয়েছে। দেখি ও দেখে (সমাপিকা) যেমন। অনেকে দেখে শব্দের স্বরধ্বনিটি দেখাবার জন্যে দ্যাখে লিখে ফেলেন। তাঁদের ভয় দেখে-র সমাপিকা ও অসমাপিকার সারূপ্য অর্থবোধ গুলিয়ে দেবে। কিন্তু বাংলাভাষায় অভ্যস্ত পাঠক কি প্রসঙ্গ থেকে সমাপিকা/অসমাপিকা চিনতে অক্ষম? এঁরা যে আবার এক, দেখানো প্রভৃতি শব্দকে অ্যাক, দ্যাখানো লিখেছেন এমনটা দেখি না। সেখানে কিন্তু স্বরসঙ্গতির প্রবণতাটা তাঁদের মনে কোথাও কাজ করে। ভয় শুধু দেখে ও তজ্জাতীয় ক্রিয়াপদ নিয়ে। [বস্তুতপক্ষে, বাংলাভাষায় অপেক্ষাকৃত নবীন এই /অ্যা/ ধ্বনির উপযোগী বর্ণরূপকে এমন মস্ত একটা সমস্যা মনে করা হয়েছে ও সে নিয়ে এত বিচিত্র প্রস্তাব এসেছে অথচ টেঁকে নি যে তা রীতিমতো ইতিহাসের ব্যাপার। এর সাম্প্রতিকতম চেহারাটি পলাশবরন পালের পেটকাটা এ-বর্ণ এবং পেটকাটা এ-কার।] এখানে যে কথাটা বিবেচ্য তা হল একটা আশঙ্কা থেকে ধাতুর স্বরচিহ্ন পালটে দেওয়া, তাও ক্রিয়ার একটিমাত্র রূপের জন্য, ভাষা নিয়ে একপ্রকার স্বেচ্ছাচার। অনেকে বুদ্ধদেব বসুর দোহাই দেন, তিনি এরকম বানান অনুসরণ করতেন। ('পরবাস'-এও এই মর্মে চিঠিপত্র দেখেছি।) কিন্তু বুদ্ধদেব বসুর বানান চিন্তা এ ক্ষেত্রে কি খুব ভাষাতত্ত্বসম্মত ছিল বলা যায়? উপরন্তু, সে ছিল চলিত বাংলার প্রথম যুগ, নানা রকম পরীক্ষানিরীক্ষা তখন চলছিল। তবে আরও কঠিন একটা দ্বিধা তৈরি হয় দেখো শব্দ নিয়ে। এ কি বর্তমান অনুজ্ঞা যার উচ্চারণ দ্যাখো, না কি ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা যার উচ্চারণ দেখো? একমাত্র এরকম দুরূহ ব্যতিক্রমের ক্ষেত্রেই বানানের একটা প্রভেদ গ্রহণযোগ্য হতে পারে।

ক্রিয়ার আদ্য ও মধ্য অংশে স্বরসঙ্গতি/স্বরলোপের বাইরে অন্ত্য অংশ অর্থাৎ বিভক্তিচিহ্ন নিয়েও বিভ্রান্তি দেখা যায়। একটি বড়ো প্রশ্ন ক্রিয়ার অন্তিম অ-কারের উচ্চারণে যে স্বাভাবিক ও-ধ্বনি (যেমন, ছিল উচ্চারণ ছিলো) সেখানেও ও-কার দেওয়া না-দেওয়া নিয়ে। চলিতরীতিতে একটা সময় অবধি ও-কার বেশ চলতও বটে, সে খুব সুদূর অতীতের কথাও নয়। এ নিয়ে লেখকদের মনে কোথা থেকে কী আশঙ্কা এসেছিল জানি না। এক তো ইস/এন/আম/উন/উক বিভক্তি ব্যতীত হলন্ত উচ্চারণ হতে পারে না কারণ তা হলে তো বাংলা ক্রিয়াপদই হল না। বাংলাভাষায় ঠিক কতটা অজ্ঞ হলে কেউ ছিল/গেল প্রভৃতি ক্রিয়ার ব্যঞ্জনান্ত উচ্চারণের কথা ভাববে? আর, যদি ব্যঞ্জনান্ত উচ্চারণ নাই হয় তো স্বরান্ত হবে, এবং সে ক্ষেত্রে অন্তিম অ-কার বাংলার স্বাভাবিক উচ্চারণরীতিতে ও-কার ছাড়া কী হবে? সাধুরীতিতে কোনোকালে ও-কার দেওয়া হয় নি, অথচ উচ্চারণে ও-ধ্বনিই ছিল। ঐতিহাসিক ভাবেও হইল করিল ইত্যাদির ইল এসেছিল প্রাকৃত ইল্ল থেকে, সেখানেও ও-কার ছিল না। চলিতেও তাই ও-কারের প্রশ্ন নেই। কিন্তু এর থেকেও বড়ো কথা, এই অন্তিম অ-কারটি একটা বিভক্তি, এর একটা নির্দিষ্ট রূপ বজায় রাখতে হবে। অনেকে মোটের উপর অ-বিভক্তি রাখলেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে সেই সারূপ্যের ভয়ে ভোগেন। যাঁরা মনে করেন হইল-কে হল লিখলে ইংরেজি hall কিংবা কৃষির যন্ত্র লাঙল বলে ভুল হবে, অথবা হইত-কে হত লিখলে নিহত মনে হবে, এবং সেই কারণে এই কয়েকটি ক্ষেত্রে ও-কার

দিতে চান, বিভক্তিরূপের সাম্য রক্ষার কথাটা তাঁদের ভেবে দেখতে হবে। উপরন্তু, এ জাতীয় আপাত দ্ব্যর্থকতার নমুনা অসংখ্য - যেমন, সে সরল (সরে গেল, সরলমতি নয়), সে করাত (করিয়ে নিত, কাটার যন্ত্র করাত নয়), সে ডাকাত (ডাকিয়ে আনত, দস্যু নয়)। এবং এমন প্রয়োগও আছে যেখানে অর্থভেদ বোঝানোর জন্য বানানভেদ ঘটাবার কোনো সুযোগই নেই – যেমন, আমি কামাই (উপার্জন করি, অনুপস্থিত থাকা নয়), বৃষ্টি হয় (ঘোড়া 'হয়' নয়), আমি গাই (গান করি, গাভী নই)। প্রয়োগের প্রতিবেশ থেকেই এসব ক্ষেত্রে দ্ব্যর্থকতার সম্ভাবনা দূর হয়, ইংরেজিতে যার নাম disambiguation তা সম্ভব হয়ে ওঠে।

ভাষা একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান (কথাটি কিঞ্চিৎ জোর দিয়ে বলেছিলেন সোস্যুর)। ব্যক্তিবিশেষের উৎকেন্দ্রিক খেয়ালে বানান স্পষ্টতর হয়ে ওঠে না। ওপরের আলোচনায় আমরা দেখেছি, অনেক আপাত অস্বচ্ছতা যে আসলে ভাষার উচ্চারণবিঁধির সঙ্গে জড়িত তা নিয়ে বিশেষ সচেতনতা নেই বলেই সেগুলোকে অস্বচ্ছতা মনে হয়। তার কারণ বাংলাভাষারও যে একটা উচ্চারণবিধি থাকতে পারে, যেখানে স্বরসঙ্গতিজনিত ধ্বনি পরিবর্তনগুলি প্রধান, এ নিয়ে তেমন চর্চা নেই কোনো মহলেই। ব্যবহার বেড়ানো ইত্যাদিতে কেন /অ্যা/ হবে, আর ব্যতিক্রম ব্যথিত ইত্যাদিতে কেন হবে /এ/, তার প্রতিবেশগত লক্ষণগুলোই যে উচ্চারণের নির্দেশক তা আমাদের ভাষাশিক্ষার অঙ্গ নয়। যত্র তত্র ও-কার অ্যা-কারের কিছু চিহ্ন বসিয়ে যে মীমাংসা আমরা করতে চাই তা আসলে 'লালিমা পাল (পুং)' লেখার মতো [আবার রাজশেখর/পরশুরাম]। সুতপা ও সবিতা তো পুংলিঙ্গ শব্দ, কিন্তু বাঙালি নাম রূপে এগুলো পেলে তাদের আমরা পুরুষ বলে ভুল করি কি? রীতি ও প্রতিবেশ সমাজে যেমন, ভাষার কথ্য ও লেখ্য রূপের ক্ষেত্রেও তারা তেমনই নির্ণায়ক শক্তি।

আরেক প্রকার বিভ্রান্তি তৈরি হয় কিছু ধাতুর বিকল্প জোড় নিয়ে। এগুলো সবই বহুমাত্রিক ধাতু যাদের অন্ত্য স্বরে বৈকল্প্য দেখা দেয়। উদাহরণ, উগরায়/উগরোয়, উতরায়/উতরোয়, উপড়ায়/উপড়োয়, উলটায়/উলটোয়, কুলায়/কুলোয়, কুড়ায়/কুড়োয়, গুটায়/গুটোয়, গুমরায়/গুমরোয়, ঘুমায়/ঘুমোয়, ফুরায়/ফুরোয়, চুলকায়/চুলকোয়, চুপসায়/চুপসোয়, জুতায়/জুতোয়, ফুসলায়/ফুসলোয়, লুকায়/লুকোয়, শুধায়/শুধোয়। এগুলো [আ] → [ও] / [উ] --- এই স্বরসঙ্গতির ফল (যেমন, জুতা → জুতো)। এদের বানান নিয়ে খুব অসুবিধে নেই, সকলেই প্রায় ও-কার দিয়ে থাকেন। কিন্তু এইসব ক্রিয়ার অনুসরণে আর এক ঝাঁক ক্রিয়ার প্রচলন আছে যেগুলোকে ঠিক স্বরসঙ্গতিজনিত বলা চলে না কারণ সেখানে /ই/-এর প্রতিবেশে /আ/-স্বর /এ/ না হয়ে /ও/ হচ্ছে। সেগুলোকে বলা যায় সাদৃশ্যজনিত সমতা বা analogical levelling–এর ফল – যেমন, এগায়/এগোয়, কিলায়/কিলোয়, খিঁচায়/খিঁচোয়, গিলায়/গিলোয়, চিল্লায়/চিল্লোয়, ছিটায়/ছিটোয়, ছিটকায়/ছিটকোয়, জিরায়/জিরোয়, ঝিমায়/ঝিমোয়, ঠিকরায়/ঠিকরোয়, তিষ্ঠায়/তিষ্ঠোয়, থিতায়/থিতোয়, নিকায়/নিকোয়, নিংড়ায়/নিংড়োয়, পিছায়/পিছোয়, পিছলায়/পিছলোয়, বিকায়/বিকোয়, বিলায়/বিলোয়, বিগড়ায়/বিগড়োয়, ভিজায়/ভিজোয়, ভিড়ায়/ভিড়োয়, সিঁটকায়/সিঁটকোয় ইত্যাদি। (যথার্থ স্বরসঙ্গতিজাত রূপভেদও এদের কারও কারও পাওয়া যায়, যেমন ছিটায়/ছেটায়, গিলায়/গেলায়।) সমস্যা এই, ওপরে উল্লিখিত ক্রিয়াগুলোর কোনো কোনোটার এগয় পিছয় জাতীয় বানান দেখা যায়। ও-কার বাদ দেওয়ার পরিণামটা ভেবে দেখার মতো। খিঁচোলে-র বদলে খিঁচলে লিখলে, ছিটোলে-র জায়গায় ছিটলে লিখলে, পিছোলে না লিখে পিছলে লিখলে কি একই কাজ বোঝাবে? আবার, ভিড়োবে প্রযোজক ক্রিয়া, তার জায়গায় ভিড়বে লিখলে অর্থভ্রান্তিও তৈরি হবে না কি? সুতরাং এইসব ক্রিয়ায় রূপবৈকল্প্য তৈরি হচ্ছে ও-কারটিকে ঘিরে, সেটি বাদ দিলে চলে না। আবার, পুরোপুরি স্বরসঙ্গতির নিয়মে আর এক দল ক্রিয়ার বিকল্প রূপও তৈরি হচ্ছে – যেমন, দৌড়াল/দৌড়োল, পৌঁছাল/পৌঁছোল। নৌকা যে কারণে নৌকো হয় এও তা-ই। কিন্তু হয়তো উচ্চারণ নিয়ে সংশয় থাকে না বলে প্রায়শ লেখা হয় দৌড়ল পৌঁছল। কেউ বলতে পারেন এগুলো দৌড়িল/পৌঁছিল রূপ থেকে এসেছে। তা হলে তো এদের উৎসে √দৌড়/√পৌঁছ্ ধাতু আছে এবং ক্রিয়ার ইল-অংশের /ই/ লোপ পেয়েছে বলতে হয়, এবং সে ক্ষেত্রে উচ্চারণ হবে দৌড়্-ল/পৌঁছ্-ল। কিন্তু

সেটাই আমাদের উচ্চারণ কি? তাই ধাতুর অন্ত্য আ-কার যেখানেই বিকল্পে ও-কার হয়েছে সেখানে বানানে ও-কারকে স্বীকার করতেই হবে। [এই বিকল্প রূপগুলো থেকে স্বতন্ত্র ধাতু √ফুরো, √ছিটো ইত্যাদি চিহ্নিত করা যায় কি না তাও একটা প্রশ্ন। অসুবিধে এই যে, (১) এরা কেবল চলিতেই বিদ্যমান, (২) অসমাপিকায় এসে এরা স্বাতন্ত্র্য হারায়, এদের রূপ মূল ধাতু √ফুরা, √ছিটা প্রভৃতির সঙ্গে সমান হয়ে যায়, ফুরিয়ে, ছিটিয়ে। এদের জন্ম ও অনিশ্চয় বিচরণ যে মান্য চলিত বাংলা নামক উপভাষাটার ক্রিয়ারূপের মধ্যে সীমিত তা নিয়ে কোনো সন্দেহ থাকে না।]

(পরের অংশে যাওয়ার জন্যে বিষয়সূচিতে ফিরুন)

(পরবাস ৬৭, জুন ২০১৭)

© 1997 - 2017, Parabaas, Inc. All rights reserved.